Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্যের দ্বিভাজন : দ্বিভাজনের সত্য ঈশ্বরচন্দ্রের Notes on the Sanskrit College : একটি মন্তব্য

Volume	45
Issue	1
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাশীনাথ রায়
Published online	October 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v45i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.5
Pages	১১৬-১২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

সত্যের দ্বিভাজন : দ্বিভাজনের সত্য

ঈশ্বরচন্দ্রের Notes on the Sanskrit College : একটি মন্তব্য

কাশীনাথ রায়*

ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্য প্রয়োজনেই ভারতবর্ষীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ঘটেছিল— এ কথা উচ্চারিত হতে হতে আজ প্রায় বর্ণহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃতি-ক্লেশে একইভাবে ক্লিষ্ট লর্ড মেকলের ১৮৩৫ সালের সেই বিখ্যাত উক্তিটি যাতে বলিষ্ঠ বাক-ভঙ্গিমায় প্রথমবারের মতো মূর্ত হয়ে উঠেছিল এক mimic Englishman যিনি হবে "Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions in morals and intellect"। এমন নকল ইংরেজি তৈরী করবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রসূত পাশ্চাত্য শিক্ষা নয়, সাহিত্য ও কৃষ্টিনির্ভর ইংরেজি শিক্ষার সুপারিশ মেকলে কেন করেছিলেন তারও উত্তর আমাদের অজানা নয়। তবু যেহেতু উপমহাদেশের মনোজগৎ এখনো ঔপনিবেশিকতামুক্ত হতে পারেনি, সেহেতু আর একবার আমরা পুরনো প্রশ্নের স্মারণিক উত্তর জেনে নিতে পারি।

ঔপনিবেশিকতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে মানবতাবাদ আর রোমান্টিসিজম্-এর মুখোশ পরিয়ে উপস্থাপন করতে পারলে সাম্রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে সাধিত হতে পারে— এই কথাটি অনুভব করেছিলেন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ধূর্ত লর্ড মেকলে। মানবতাবাদ আর রোমান্টিসিজম্-এর জন্য সাহিত্যের চেয়ে বড়ো ধাত্রী আর কি হতে পারে! অতএব ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ চাই। তাতে করে ভারতীয় প্রজাকুল তাদের শ্বেতাঙ্গ রাজার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা অনুধাবন করতে পারবে, বুঝতে পারবে বৃটিশ এদেশে রাজত্ব করতে আসেনি, এসেছে সাংস্কৃতিক মিশনারীর জ্যোতির্ময় মিশন নিয়ে, অন্ধকার ভারতবর্ষের সভ্যতার বিচ্ছুরণ ঘটাতে। এহেন নির্মোহ হিসাব-নিকাশের ইঙ্গিতেই মেকলে-পর্বে এসে ইতঃপূর্বেকার বৃটিশ প্রাচ্যবাদিতা (British Orientalism) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কারণ বৃটিশ প্রাচ্যবাদিতায়

* সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের আসনটি অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষার ছিল না, ছিল অনুরাগ ও শ্রদ্ধার। একই কারণে খ্রীস্টান মিশনারীদের হাতে সাম্রাজ্যবিস্তারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে রাজি ছিলেন না মেকলেরা। কারণ তাতে ধর্মান্তরের হাত ধরে নিজ ঘরের ধর্মীয় কোন্দল হীরকতুল্য উপনিবেশে প্রবেশ করে বিপত্তি ঘটাতে পারে। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী নিয়ে যে-শ্রেণীটিকে আমরা Intelligentsia বলি, যে-শ্রেণী ইতিহাসের সব ক্রান্তিকালে সমাজের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে, সেই শ্রেণীটিকেই মেকলে তার শিক্ষা-প্রকল্পের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন। ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের আলোকে আলোকিত ভারতীয় শিল্পী- সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী বৃটিশ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আমৃত্যু অনুগত থেকে ভারতের অবশিষ্ট প্রজাকুলকে রাজার প্রদর্শিত পথে হাঁটতে শেখাবেন— এ-ই ছিল মেকলের প্রত্যাশা। এ-প্রত্যাশা যে বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছিল— উপনিবেশ– উত্তর যুগেও প্রাগুক্ত ঐতিহ্যের সদম্ভ বিচরণ দেখে আমরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি।

অনুকার-কলায় পারদর্শী নকল সাহেব তৈরির এই যে মহাকাল-জয়ী প্রকল্প, এটি সর্বাংশে নিষ্কণ্টক ছিল না। না থাকার কারণে সাহিত্যের সেই উপনিবেশভেদী মানবতাবাদ যাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মেকলে। মানবতাবাদ স্বাধিকার, স্বাধীনতা আর সাম্যের ধারণার পরিচর্যা করে, যেমন করেছিল ভারতীয় নকল সাহেবের বেলায়। মানবতাবাদ ব্যক্তিকে সার্বভৌম মহিমা দান করে, যেমন করেছিল মেকলের শিক্ষা-প্রকল্পের বেলায়। সে-কারণেই বর্ণাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক শেষাবধি অনুকৃতির বাহনমাত্র থাকেনি, স্বাধীন ভারতীয় সত্তার অন্বেষণে মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক উপস্থিতি নিয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আমরা অবশ্য বাংলার নবজাগরণের সুফল কিংবা সীমাবদ্ধতা কোনটিকেই মুখ্য করতে চাইনা। আমাদের উদ্দিষ্ট সেই ঔপনিবেশিক প্রতিমূর্তি (mirror-image), সেই mimic Englishman যে, মেকলের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রকল্পের কেন্দ্র অধিকার করেছিল। মেকলের জন্য কতোটুকু সুখকর ছিল mimic Englishman? আমাদের জন্যেই বা তার সুকৃতি কতোটুকু?

ঔপনিবেশিক শাসনের দৃষ্টিতে শেষ-বিচারে প্রীতিময় হয়ে ওঠেনি mimic Englishman। উপনিবেশের দর্পণে যে মুখ দেখা যায়, যে-মুখ কার্যতঃ

দেখেছেন শ্বেতাঙ্গ সাহেব, সে-মুখ বড়ো বেশি প্রতিসারিত, বড়ো বেশি তির্যক। কখনো কখনো অবাধ্য হয়ে ওঠে, কখনো কখনো প্রতিপক্ষ। এরকমটিই ঘটে থাকে উপনিবেশের অস্থির মাটিতে, এরকমটিই ঘটেছিল, ভারতবর্ষের বিস্তৃত আঙিনায়। সর্বাধিক ঘটেছিলো স্পর্শকাতর বঙ্গদেশে। যে-কারণে ইংরেজ/ইউরোপীয় মানবতাবাদী ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙালি mimic Englishman ক্ষেত্র বিশেষে শ্বেতাঙ্গ সাহেবের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে-কারণে অনুগত পাঠান/ পা াবীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাহেব তার বাঙালি mirror-image-কে, বাঙালি প্রতিবিম্বকে, 'বাবু' বলে পরিহাস করতো, সাহেবের এ-দেশীয় উত্তরসূরীরা যে-কারণে এখনো তার কালচারকে 'বাবু কালচার' বলে পরিহাস করে থাকে। অর্থাৎ মেকলের শিক্ষা-প্রকল্প ক্ষেত্রবিশেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে— যে কারণে প্রকল্প-উদগত Bengal Renaissance আমাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ দাবি করতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় মনোজগতের বিস্তার ও প্রবৃদ্ধিতে মেকলের লক্ষ্যভ্রষ্ট mimic Englishman-দের অবদান পর্বতপ্রমাণ। অবশ্য আমাদের জন্যে মেকলে প্রকল্পের এটিই একমাত্র উপহার নয়। এর সঙ্গে আর একটি দুনির্ণেয় উপহার জড়িয়ে আছে, মতান্তরে যেটিকে বিষময়, এমনকি ট্রাজিক মনে হতে পারে। আর তা হচ্ছে আমাদের সত্তার দ্বিভাজন, সত্যের দ্বিভাজন। একজন যুগান্তকারী বাঙালির একটি বিশেষ টীকাকে কেন্দ্র করে এই দ্বিভাজনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে চাই আমরা। এই যুগান্তকারী বাঙালি হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং উল্লিখিত টীকাটির শিরোনাম : *Notes on the Sanskrit College*।

বলা বাহুল্য, ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আলিঙ্গন করবার মতো দীর্ঘ বাহু উনিশ শতকের ভারতবর্ষে মাটিঘেঁষা সাধারণ মানুষের ছিল না; ছিল বিত্তবান, সুবিধাভোগী মানুষের, ইংরেজিতে যাকে আমরা এলিট বলে থাকি। সম্ভবতঃ এ-কারণেই the Bengal Renaissance — বাংলার নবজাগরণ— শেষ বিচারে একটি এলিটিস্ট আন্দোলন থেকে গেছে। অবশ্য মেকলে প্রকল্প খুঁটিয়ে দেখলে বলতেই হবে, ইংরেজি শিক্ষা এলিট শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকুক— তা তিনি চাননি, চেয়েছিলেন তার নির্বিঘ্ন বিস্তার, যে-বিস্তারে শিক্ষিত এলিট— অর্থাৎ তার স্নেহের mimic Englishman বর্তিবাহকের (Conduit-এর) ভূমিকা পালন করবে। এটিকেই বলে পরিস্রুতি তত্ত্ব, filtration theory। অর্থাৎ প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসকে বিলোপ করে নয়, তাকে অটুট রেখেই বিস্তার ঘটবে ইংরেজি

শিক্ষার। এ-বিস্তারে স্বাভাবিকভাবেই বর্তিবহনের দায় থাকবে— ইংরেজি নয় — সাধারণ্যে সহজগ্রাহ্য কোন দেশীয় ভাষার— অর্থাৎ বাংলার। (বাংলার এই ঔপনিবেশিক উত্থানের কথা কারোরই অজানা নয়)। অর্থাৎ ইতোমধ্যে বিভাজিত লোক-সমাজে মেকলের শিক্ষা-প্রকল্পের কল্যাণে আর একটি বিভাজন সংযোজিত হলো। আর তা হলো ভাষা-ভিত্তিক। একদিকে রাজার সান্নিধ্যপুষ্ট ইংরেজি, অন্যদিকে সংস্কৃতের ভারপীড়িত লোকায়ত সংস্রবে মলিন বাংলা। এই বিভাজনের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে কলকাতা শহরের একই প্রাঙ্গণস্থিত দুটি ঐতিহাসিক কলেজ : হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ। প্রথমটি ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পাদপীঠ যেখানে ইংরেজি ভাষী শহুরে বিত্তবানেরা তাদের সন্তানদেরকে পাঠাতেন। দ্বিতীয়টি সংস্কৃতশিক্ষার সনাতন পাদপীঠ, যেখানে বাংলার প্রতি অসংকোচ মমত্ব ছিল, যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুসন্তানেরা ঐতিহ্যলালিত শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হতেন, যাদের সবাই অবধারিতভাবে শহুরে ছিলেন না এবং যাদের একজন হয়ে এসেছিলেন গ্রামের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিক্ষাবিদ হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের শুরু করেছিলেন ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজে বাংলার একজন প্রশিক্ষক হিসেবে। কলকাতা শহরে নবাগত সাহেবদের বাংলা শেখানো ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এ-কাজে বাংলা শিক্ষণের বর্ণমালা, ব্যাকরণ, বাংলাভাষার মূল বৈশিষ্ট্যবাহী সহজ গদ্যরচনা ইত্যাদির সহজ পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করার কাজটিও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিনির্মাণে জড়িত ছিলেন তিনি। যে-ভাষা ব্যবহার করে শ্বেতাঙ্গ সাহেব বাংলার প্রজাকুলকে শাসন করবেন, সে-ভাষার ধাত্রী হওয়াটাকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ সহজ দৃষ্টিতে না-ও দেখতে পারে। সে-ক্ষেত্রে আমরা ঔপনিবেশিক প্রতিমূর্তির (mirror-image) প্রতিসারিত (refracted) রূপটির কথা স্মরণ করে বলবো, এই ধাত্রীর হাতে নির্মিত ভাষাটি জাগরণের ভাষা শুধু নয়, প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেও পরবর্তীকালে উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের যে টীকাটিকে আমরা অবলম্বন করেছি, সেটি তিনি রচনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক হিসেবে। তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল এমন একটি পাঠক্রম যেখানে ভারতীয় (সংস্কৃত) ও ইউরোপীয় (ইংরেজি) শিক্ষার দুই বিরুদ্ধপ্রায় ধারা পাশাপাশি অবস্থান করবে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক হিসেবে হিন্দু কলেজের মতাদর্শকে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশীয় অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ হিন্দু শিক্ষা, দর্শন, ধ্যান-ধারণাকে তার আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে দেয়নি।

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের অভীষ্ট ভিন্ন ছিলো। হিন্দু টোলের প্রচলিত শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা নগরবাসী এলিটশ্রেণীর কাছে অর্থবহ করে তোলার অঙ্গীকার ছিল তার। সংস্কৃতের ওপর জোর দেয়া হবে ঠিকই, কিন্তু তা হবে মাতৃভাষা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে।

Notes on the Sanskrit College-এর শুরু এ-ভাবে: "the first object of those who are entrusted with the superintendence of education in Bengal" হচ্ছে "the creation of an enlightened Bengali literature"। Notes এগিয়ে যায় : "Such a literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive Bengali"। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকল্পিত বাংলা সাহিত্যের দ্বিভাজনটি লক্ষ্য করুন : এ-সাহিত্যের উৎস-বিষয়বস্তু হবে ইউরোপীয়, আর ভাষাটি হবে বাংলা। বিভাজন জ্ঞানার্জনের উৎস এবং শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানবিতরণের মাধ্যমের মধ্যে। লক্ষণীয় এই যে, Notes প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলনের কিংবা মিশ্রণের কথা বলে না, দুটিকে বড় বেশি ভিন্ন, বড় বেশি বিভক্ত করে রাখে। সন্দেহ নেই, ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বাংলা ভাষাকে একটি প্রবর্তন-প্রক্রিয়ার উপাদান হিসেবে দেখেছেন। এ-দুটি বস্তুই বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনব। এই অভিনবত্বের সাঁকো বেয়েই পাশ্চাত্য জ্ঞান বাংলা ভাষার করমর্দন করছে। Notes-এর প্রথম উদ্বেগ বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি নিয়ে। এ উদ্বেগ মেকলে-ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, কারণ এতে উপনিবেশিতের জন্য মনোজাগতিক বিচরণক্ষেত্রের নির্দেশনা আছে। ইংরেজি নয়, বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য-শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষিত বঙ্গবাসী অতঃপর সে-শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে সাধারণ্যে 'conduit' অর্থাৎ বর্তিবাহকের ভূমিকা পালন করবে নাকি?

সাহিত্যকে ধারণ করবার জন্য যে বাংলাভাষার সন্ধান করেছিলেন বিদ্যাসাগর সেটি হবে মার্জিত, অভিব্যক্তিময় ও বাগবৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ : 'elegant', 'expressive' ও 'idiomatic'। যে পথে গেলে এমন বাংলার দেখা মিলবে, সে-পথটিকেও খুঁটিয়ে দেখছেন তিনি: "An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of

those who are not good Sanskrit scholars. Hence the necessity of making sanskrit scholars well versed in the English language and literature"। সংস্কৃতের পৌরহিত্যেই বাংলাভাষার উন্মেষ ঘটতে হবে; কিন্তু তা হবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যায়। অর্থাৎ তার দেহ হবে বাংলার কিন্তু অন্তর হবে ইংরেজির। পাশ্চাত্য প্রজ্ঞার বাহন হিসেবে বাংলাকে দেখছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর দৃষ্টিতে এখানেই সংস্কৃত কলেজের উপযোগিতা, কারণ তিনি বিশ্বাস করনে : "mere English scholars altogether incapable of expressing their ideas in elegant and expressive Bengali"। সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থীরা যদি ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য আহরণ করতে পারে, তবে তারাই হবে আলোকিত — 'enlightened' — বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সফল নির্মাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র এরপর elegant, expressive ও idiomatic বাংলার উপযোগী সিলেবাস প্রণয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। এ-সিলেবাসের শুরু হবে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত দর্শন ও বিধান দিয়ে। সেখানে সনাতন হিন্দু অঙ্কশাস্ত্রের ঠাঁই একেবারেই নেই। তার কারণ, বিদ্যাসাগরের মতে, ইংরেজি কিংবা পাশ্চাত্য অঙ্কশাস্ত্র বিদ্যার্থীর হাতে তুলে দিতে পারে "in less than half the time ... more than double the amount of sound information that he could obtain by the most perfect acquaintance with all that exists in the Sanskrit language in the subject" । *Notes* -এর সাক্ষ্য অনুসারে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য-পন্থা প্রায় সমার্থক। যেহেতু তিনি আধুনিকতার পক্ষে, সেহেতু তাঁর সিলেবাসে স্থান পেতে হলে পঠিত বিষয়কে পাশ্চাত্যকৃত অথবা ন্যূনপক্ষে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এখানে এসে হিন্দু দর্শনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিদ্যাসাগরের আপন দর্শনকে দৃশ্যতঃ দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। জ্ঞানের আপেক্ষিকতার ধারণাকে আশ্রয় করেন তিনি এবং নতুন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্মাতার হাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-ধারাকে মেলাবার দুরূহ গুরুভার তুলে দেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি, সংস্কৃত দর্শনে ব্যুৎপত্তি এদেশীয় শিক্ষার্থীকে পাশ্চাত্যদর্শনের ভাণ্ডারে অকৃপণ প্রবেশাধিকার দেবে, জ্ঞান-জগতের আবশ্যকীয় ধ্যান-ধারণা ও হাতিয়ার সরবরাহ করে দর্শন-ভাবনার যোগ্য করে তুলবে তাকে। ঈশরচন্দ্র

সাদৃশ্য-ধারণার কথা— correspondence- এর কথা ভাবছেন, ফলে ভাবনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা দ্বিত্ব — duality — তাঁর চোখে পড়ছে না। দুই বিরুদ্ধ ধারার সহবাস নিশ্চিত করতে গিয়ে তিনি ভাবনার বৈকল্পিকতা (duplication) এবং প্রতিলৈপিকতার (replication) হাতে বন্দি হয়ে পড়েছেন। এখানেই বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ বিতর্কের শুরু। বলাবাহুল্য, বিতর্কটি ছিল দু'টি ভিন্ন ধারার দর্শন-পদ্ধতিকে এক করা নিয়ে। ব্যালেন্টাইন এহেন মিশ্রণের পক্ষে ছিলেন না। তার মতে এ মিশ্রণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি বিপজ্জনক বিশ্বাসের জন্ম দেবে। তাহলো; সত্য দ্বিধাবিভক্ত, "Truth is double"। ব্যালেন্টাইন-এর আপত্তি ভাষায় দ্বিত্ব নিয়ে নয়, সংস্কৃত ও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখতে তাঁর আপত্তি নেই; বরং সম্মতি আছে, কারণ ইংরেজিতে পারদর্শী সংস্কৃত (তথা বাংলা) পণ্ডিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতজনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঠিক পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন : "it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two..."।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীরা যে শুধু দুই পৃথিবীর মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে, তা-ই নয়, তারা বিভেদ উজিয়ে দু'য়ের মধ্যে ঐক্যর সেতু রচনা করবেন। ব্যালেন্টাইন-এর ভাষায় তাদের দায় হবে "removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by recognising that European science recognises all those elementry truths that had been reached by Hindu speculation"। (ব্যালেন্টাইন কথায় মেকলে প্রতিধ্বনিত হলে আমরা বিস্মিত হবো না।) হিন্দু ভাবনা ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যালেন্টাইন যে প্রকৃত মিল— real agreement — প্রত্যাশা করেন, সেটি নিয়েই তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত পাঠক্রম সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করে বৈসাদৃশ্যকে উৎসাহিত করে। কাজেই বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য ন্যায়শাস্ত্রকে আসনচ্যুত করে সংখ্যা ও বেদান্ত দর্শনকে জায়গা করে দেন ব্যালেন্টাইন, সঙ্গে জুড়ে দেন Bishop Berkeley-র

'Inquiry' যার কল্যাণে দুই রীতির মিলনবিন্দুগুলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। ব্যালেন্টাইন বারবার ঐক্য সাধনের আবশ্যকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, বারবার বলছেন বঙ্গভূমি তথা ভারতবর্ষের জন্য যে-কোন হিতকর শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য হবে "binding the chasm between the Sanskrit and the English—between the learning of India and the science of England....."। অথচ ব্যালেন্টাইন-এর মতে, বিদ্যাসাগরের উপহার ঐক্যপ্রসূ নয়। তাঁর দুই করতলে দুই ভিন্ন পাত্র, যার একটিতে সংস্কৃতবাহী হিন্দু দর্শন, অন্যটিতে ইংরেজিবাহী ইউরোপীয় জ্ঞান-সাধনা। এই দুই ভিন্ন পাত্রের প্রশ্নসাপেক্ষ পুষ্টির কারণে শিক্ষার্থীর মনোজগতে সত্য দ্বিখণ্ডিত হবে, অনন্যোপায় হয়ে সে জানবে : "Turth is double"।

ব্যালেন্টাইন-এর যুক্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন বিদ্যাসাগর। যে সাংখ্য-বেদান্ত দর্শন তর্কাতীতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, শুধু পুরোহিতবর্গের দীর্ঘ অহেতুক শ্রদ্ধায় বিহ্বল হয়ে সেই সাংখ্য-বেদান্তের সঙ্গে Berkeley-Inquiry যোগ করে স্বাস্থ্যকর কোন দর্শন-জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়া যাবে না। আর সত্যের দ্বিভাজনবিষয়ক ভীতির উত্তরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য : "Truth is truth if properly perceived. To believe that 'truth is double' is but effect of an imperfect perception of truth itself"। তিনি যে পাঠক্রমের প্রস্তাব করেছেন তা অবশ্যই শিক্ষার্থীকে প্রকৃত সত্য— 'true' truth -এর সভায় নিয়ে যাবে।

বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস কিংবা প্রস্তাবিত পাঠক্রম কোনটিকেই মর্যাদা দেননি তৎকালীন শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক Mouat। এই প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের ফলে Ballantyne -বিদ্যাসাগর বিরোধের তাৎপর্য কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ বিরোধের গভীরে ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে দু'জনের দৃষ্টির ভিন্নতা। ব্যালেন্টাইন-এর বিরুদ্ধ ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আগ্রহী ছিলেন না বিদ্যাসাগর; সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীকে ব্যালেন্টাইন প্রস্তাবিত দুই ভিন্নবাক ঐতিহ্যের মধ্যবর্তী দোভাষীর ভূমিকায় দেখতেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার, বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার আধুনিকায়ন, যার পৃষ্ঠপোষণ ছুঁতমার্গী সনাতন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যা কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ছত্রচ্ছায়ায়

সাধিত হতে পারে। সেতু নয়, সংযোগ নয়, দোভাষী নয়, তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানপ্রিয়, আধুনিক, পাশ্চাত্য পাঠক্রমপুষ্ট শিক্ষক-সৈনিক : "Perfect masters of their own language," যাদের হাতে থাকবে "a considerable amount of useful information." এবং যারা হবে "Free from the prejudice of their country"। বিদ্যাসাগরের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট, তাঁর পাঠক্রমের ভিত্তি— epistemological base — হবে পাশ্চাত্য জ্ঞান আর ভাষা হবে বাংলা। এতদুদ্দেশ্যেই ভাষা হিসেবে বাংলার বিকাশ চেয়েছেন তিনি এবং এই বিকাশের স্বার্থেই স্বীকার করেছেন সংস্কৃতকে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-প্রকল্পে একটি দুর্বিনীত বিভাজন রেখা শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শিক্ষার মাধ্যম থেকে আলাদা করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিভাজন কি আমাদেরকে সত্যের দ্বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়? এ বিভাজন জ্ঞান-ক্ষেত্রেও বিভাজন সৃষ্টি করে কি? Is truth double? ঔপনিবেশিক শিক্ষার পাঠশালা থেকে যে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটতে যাচ্ছিল একমাত্র তাকেই সামনে রেখে এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব। একটি নতুন আলোকিত বাংলা সাহিত্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায় আলোড়িত বিদ্যাসাগরের মধ্যে এক নতুন আলোকিত বাঙালিকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে ছিলো। এ আকাঙ্ক্ষা কি সেই জাতিসত্তার বাস্তবতায় অনূদিত হতে পেরেছে যে জাতিসত্তা সমাজের সকল স্তরকে ধারণ করতে পারে। যে জাতিসত্তা ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-লিঙ্গ ভেদের কণ্টকিত দেয়াল অতিক্রম করে যেতে পারে, নতুন আলোকে আলোকিত নবীন বাঙালি এ-দেয়াল অতিক্রম করুক, বিদ্যাসাগর অন্তত তা-ই চেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের স্থপতি হিসেবে, বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে, নারী শিক্ষার প্রবর্তক- প্রচারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের বিশাল কর্মকাণ্ড সে সাক্ষ্যই বহন করে।

শিক্ষা-প্রসারের যে আঙ্গিনায় পদার্পণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর তা অবশ্যই একই সঙ্গে বিভাজন ও বিভাজিত ছিলো। শাসনের বাহুকে দীর্ঘতর করবার অভিলাষে শ্বেতাঙ্গ শাসক একদিকে যেমন চেয়েছিল mimic Englishman-এর সৃজন ও উপস্থিতি, অন্যদিকে তেমনি চেয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষার ব্যাপকতর বিস্তার। শাসকের এই দ্বিমুখী প্রকল্পে বিদ্যাসাগর যে নিজেকে একজন বর্তিবাহক— একজন disseminator— হিসেবে দেখেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমরা কিছুতেই ভুলবো না যে শাসকের বৃহত্তর প্রকল্পের অভ্যন্তরে তাঁর নিজের একটি

স্বতন্ত্র প্রকল্প ছিল আর সে প্রকল্পের কেন্দ্রে ছিল নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রজনন ও বিকাশ। আমরা জানি এ বিকাশের দায় প্রথম ও শেষাবধি বিদ্যাসাগরেরই আলোকিত বাঙালির কাঁধে পড়েছিলো। ইতিহাসের এক দিগন্ত বিস্তৃতি পরিহাসে এই বাঙালির সাহেবীকরণ নিয়ে আজো আমরা কেউ কেউ গোপনে ঈর্ষাকাতর, প্রকাশ্যে খড়গহস্ত হই। নিজ ভাষার প্রতি কৃত্রিম মমত্ববশে আমরা প্রায়শই ভুলে যাই, *Notes on the Sanskrit College*-এ প্রস্তাবিত পাঠক্রম দিয়ে বিদ্যাসাগরই সাহেবীকরণের সূত্রপাত করেছিলেন। তবে সাহেবীকরণের শিরোদেশে তিনি সনাতন সংস্কৃত সাহিত্য আর আপন মাতৃভাষার অক্লান্ত পরিচর্যার দায় সযত্নে রক্ষা করতে ভুলে যাননি।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-প্রকল্প ব্যালেন্টাইন-এর সাহেবের উৎকণ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণী অতিক্রম করতে পারেনি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য সেই বিশালকায় বাঙালি যিনি তাঁর স্বকালের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় সাহেব, যার কবিতা ঈশ্বরচন্দ্রের আলোকিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান স্ফূরণ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত। দু'টি ভিন্ন ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যদেশে দোদুল্যমান মধুসূদন শুধু বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিক যে-কোন সমাজ, যে-কোন জাতিসত্তার বিক্ষুব্ধ প্রতীক হতে পারেন। কারণ শেষবিচারে আমাদের জন্য 'সত্য' সত্যিসত্যিই দ্বিভাজিত : "Truth is double"।

তথ্য নির্দেশিকা

১. এই রচনায় প্রধানতঃ বিনয় ঘোষকৃত *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ* (কলকাতা, ১৯৮৪) গ্রন্থটিকে অবলম্বন করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর ও ব্যালেন্টাইন -এর মধ্যকার পত্রাবলীসহ Notes -এর যাবতীয় উদ্ধৃতি উক্ত গ্রন্থ থেকে উৎকলিত।

২. ঔপনিবেশিক প্রতিমূর্তি (mirror-image) বিষয়ে Franz Fanon -কৃত *Black Skin, White Masks* (London: Pluto Press, 1986) গ্রন্থের H. Bhaba রচিত ভূমিকা পঠিত হতে পারে।